মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম

পিনাকী ভট্টাচার্য

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ছেচল্লিশ বছরের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সেরা অর্জন ঠিক তার জন্মের সময়ে। অর্জন-স্বাধীনতার আরাধ্য সুখ। রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে পাওয়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বিজয়ের গৌরবগাঁথা স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে চেতনার বহ্নিশিখা, ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার প্রথম পাঠ। কী সেই চেতনা? কোন সে পাঠ? খাবার যত সুস্বাদু হোক না কেন, তাতে এক ফোঁটা বিষ যে কারো মৃত্যুর উপলক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাস যতই মজাদার হোক না কেন, তাতে সত্যের অপলাপ হলে, সেই ইতিহাস নির্মাতাদের আগামী প্রজন্মের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনার ধারণা আর সত্যের পাঠোদ্ধার তাই সময়ের অন্যতম বড় দাবি।

অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে জাতির সামনে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এক বয়ান হাজির করা হয়েছে। যে বয়ানে ইসলামের চিরায়ত দর্শন শুধু অনুপস্থিতই নয়; কখনো আসামি, কখনো পরাজিত। অথচ গল্পটা অন্যরকম। বলা যায় ১৮০ ডিগ্রি উল্টো। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাপিত ধর্ম হিসেবে ইসলাম সব সময়ই আলোক মশাল বহন করেছে। ইসলাম তার স্বভাবসুলভ চরিত্রে সুবিচার প্রত্যাশী, মুক্তিকামী গণমানুষের চেতনার প্রদীপে আলো জ্বালিয়েছে। সে আলো ছড়িয়েছিল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। ৭১-এ ইসলামের পরাজয় হয়েছে বয়ান দিয়ে যারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন, তারা এবার ঝেড়ে কাশি দিন। ছেচল্লিশ বছরের মিথ্যা বয়ানের মুখোশ খুলে দিয়ে ইতিহাসের সাগরে নতুন ঢেউ তুলেছেন প্রখ্যাত লেখক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্য। ডাক্তারি পেশা ছেড়ে লেখালেখির চ্যালেঞ্জ গ্রহণের স্বার্থকতা এনে দিয়েছেন তিনি *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* গ্রন্থে। ইতিহাসের পাঠ এত প্রাঞ্জল উপস্থাপনার কৃতিত্ব নিশ্চয় উনার লেখক সত্তার বড় অর্জন। তথ্য-উপাত্ত এবং প্রামাণ্য দলিলের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের হারিয়ে দেওয়া বয়ানকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন; অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন। এ যেন ইতিহাসের এক নয়া পাঠ!

অসামান্য আবেদনের এই ঐতিহাসিক বইটি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন* গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। আমরা সম্মানিত লেখকের প্রতি বিনয়ের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশিষ্ট লেখক ও মানবাধিকার কর্মী মুসতাইন জহির ভূমিকা এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী গৌতম দাস পরিশিষ্ট লিখে বইটির পূর্ণতা এনে দিয়েছেন। আমরা দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, এই বইটি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক বয়ান জাতির সামনে উপস্থাপন করে ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধের কৃত্রিম বিভেদের দেয়াল ভেঙে-উপড়ে ফেলবে। সত্য এভাবেই আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
অক্টোবর- ২০১৭

লেখকের কথা

'বয়ান' শব্দ এখানে চিন্তার কন্সট্রাকশন বা চিন্তা-কাঠামো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একেক চিন্তার ফ্রেম বা কাঠামোর কারণে মানুষের একেক ধরনের বয়ান হতে পারে। এই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলামের ভূমিকা কেমন ছিল, তা খুঁজে দেখার সিরিয়াস কাজ হয়নি। বাংলাদেশের সেক্যুলারপন্থিরা একদিকে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে ইসলামের বিরোধিতা করে, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেও ইসলামের বিরোধিতা করে। আসলে তারা মূলত ইসলাম বিদ্বেষের (Islamophobia) জায়গা থেকে এটা করে থাকে। তারা ইসলাম আর মুক্তিযুদ্ধকে এমন পরস্পর বিরোধিভাবে দাঁড় করায়; যেন একটা থাকলে আর একটা থাকবে না। তাদের সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম ও এর অবদান, ব্যবহৃত পরিভাষা এবং নাম-চিহ্নগুলো সব সময় আড়াল করার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের ধুলো-কালি সরিয়ে সেই আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া আজকের সময়ের দাবি।

একাত্তরের ১০ এপ্রিল (পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ এপ্রিল) স্বাধীনতার ঘোষণা (Proclamation) করা হয়েছিল। সেখানে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছিল- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষিত ও লিখিত উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক মানুষের এক সাম্য প্রতিষ্ঠা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম ও চর্চার উপযোগী গণমানুষের রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এটা সেই অর্থে মডার্ন ক্লাসিক্যাল রিপাবলিক ধারণার বাইরের কিছু নয়। রুশো সামাজিক চুক্তিতে যেমন বলেছিলেন, 'আমাদের এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এবং সম্পদকে রক্ষার জন্য সমগ্র সংস্থার শক্তিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে পারি, যাতে আমরা যখন সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমরা নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত হই এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা এবং শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষত থাকে। তার কোনো ক্ষতি ঘটে না।'

এভাবেই সামাজিক চুক্তি বিকশিত হয়। এ চুক্তি কোনো নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির নিকট সমুদয়ভাবে

সমর্পণ করে। মানুষ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। আবার সকল নাগরিক মিলে একটা সার্বভৌম সত্তা হিসেবে রাষ্ট্রের অধীনে নিজেরা কনস্টিটিউট অর্থে গঠিত হয়। প্রত্যেকে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে একটা পলিটিক্যাল কমিউনিটির কাছে; অথচ ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে নত হবে না। ক্ষমতা এখানে ব্যক্তিবিশেষের নয়; পরস্পরের সঙ্গে মিলে তৈরি এক রাজনৈতিক কমিউনিটির। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় গৃহীত রাষ্ট্রগঠনের তিন নীতি বিশ্লেষণ করলে সামাজিক চুক্তির এই বক্তব্যই অনুমোদিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল, কীভাবে ইসলামের বয়ান মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করেছে, অবদান রেখে সাহায্য করেছে, তা কখনো বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ভূমিকার একটা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সর্বজনগ্রাহ্য দলিলসমূহ থেকেই এখানে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা এবং মাঠের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ইসলাম থেকে তাঁদের লড়াইয়ের বৈধতা খুঁজে নিচ্ছেন এবং নিজেকে উদ্দীপ্ত করছেন।

এই বইয়ে বিভিন্ন দলিলের বরাতে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল তার তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট গৌতম দাস পরিপূর্ণ একটা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, ইসলাম প্রসঙ্গে তথ্য-প্রমাণগুলো কেন ইসলামের বাইরের নয়, কেন ইসলামি মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এর সামাজিক পটভূমি কী ছিল। লেখাটি পরিশিষ্ট হিসেবে বইয়ের শেষে সংযোজন করা হলো। আর খুব অল্প সময়ে মুসতাইন জহির একটি ভূমিকা লিখেছেন। তাঁদের দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে বলতে হবে এই বিশ্লেষণ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়, তবে এ থেকেই আগ্রহী পাঠক যদি মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধিৎসু হন, সেটাই হবে এই বইয়ের সার্থকতা।

পিনাকী ভট্টাচার্য
ঢাকা, অক্টোবর- ২০১৭

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম বইটির শিরোনাম থেকেই প্রসঙ্গটা পড়া যাক। লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক বয়ানে ইসলাম প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন; শিরোনামে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ থেকে এতটুকু খুব সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও জাগছে, সেটা কোন বয়ান? কার বয়ান? আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে প্রচলিত যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা বয়ানের সঙ্গে পরিচিত, তাই কি? এখানে প্রশ্নটি আমাদের ভাবনায় একটা যতি চিহ্ন টেনে দেয়। আমাদের থামতে হয়, কারণ এটাও আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে যে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নামক আমাদের 'চেনা-জানা' বয়ানের পুনরাবৃত্তি এই বইয়ের উদ্দেশ্য হওয়ার কথা নয়। ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যেভাবে বিরোধাত্মক বা বিপ্রতীপ সম্পর্কের ছাঁচে ঝালাই করে আস্ত একটা জাদুঘর প্রকল্প খাড়া করা হয়েছে, এই বইটি তাকে আরেক প্রস্থ দীর্ঘতর করার কোনো প্রয়াস নয়। বরং এটা খোদ সেই পাটাতন খুলে দেখানোর চেষ্টা, যার ওপর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ধর্মরিপেক্ষতার আড়ালে ইসলাম বিরোধী একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদন করা হয়।

এই যে যতি ও বিরতি, থেমে নতুন করে দেখা এবং সেখান থেকে প্রস্থান-রেখা ও সূচনা-বিন্দু নির্ণয় করা, জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে এর একটা নাম আছে। পদ্ধতিগত দিক বিবেচনায় যাকে ছেদটানা (Epistemological break) বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমি নিশ্চিত, *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* বইটি বাংলাদেশে এই ঘটনা ঘটাবে। সেটা কেন দাবি করা যায়, সেই প্রসঙ্গে কয়েকটা নোক্তা দেওয়াই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য।

তাহলে শিরোনাম থেকে যে প্রশ্নটা জেগেছে, তার উত্তর পেতে নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে একটা নতুন বয়ান অনুসন্ধানে নামতে হবে। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষার ভাষা, যুদ্ধের ন্যায্যতা নির্মাণ ও পরিচালনায় উপাদান ও আশ্রয় হিসেবে ইসলাম কোথায়, কতটুকু উপস্থিত ছিল? তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতটুকু? শুধু ব্যাপকতার নিরিখেই নয়, পাশাপশি ইসলাম এই বয়ান সংগঠনে কতটা নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে, তা স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা থেকে যুদ্ধকালীন দলিল, রাজনৈতিক প্রচার-পুস্তিকা ও ঐতিহাসিক তথ্য-

উপাত্ত দিয়ে সুসংহতভাবে দেখানো সম্ভব কি না? আমার মতে, এই বইয়ে লেখক তা বেশ জোরালোভাবেই দেখাতে পেরেছেন বলা যায়। আর তা এমন একটা বিরাট ক্ষেত্র উন্মোচন, যা দেশের জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার বয়ানের অসারতার বাইরে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পুনরায় পাঠ করার নতুন প্যারাডাইম তৈরি করতে সক্ষম।

বলাবাহুল্য, সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী ধারার যে রাজনীতি এখন বহাল আছে, যে বয়ানকে ঘিরে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা দাবি করা হয়, তা খুব দ্রুতই ভেঙে পড়তে বাধ্য। আগেই বলেছি, বইটি একটা ঘটনার জন্ম দিবে। রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে এটা হবে যুগান্তকারী ঘটনা। এতদিন আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী বয়ানের অন্যতম প্রস্তাবনা হিসেবে দেখেছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের বিরোধিতায়, যেহেতু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ও কতিপয় রাজনৈতিক দল ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে, ধর্মের কথা বলে নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছে, সেহেতু মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্ম তথা ইসলামের সংস্রব-মুক্ত একটা রিপাবলিক (রাজনৈতিক পরিসর) এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যই হচ্ছে যেন মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা! এতদিন আমরা এর মতাদর্শগত রাজনৈতিক সমস্যার দিকগুলো প্রকাশ্য হতে দেখেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা ও সে সময়কার চেতনা থেকে জাত একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের আবশ্যিকতা উত্থাপন করা হয়। জাতীয়তাবাদী এই ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র বিশ্লেষণ বা রাজনৈতিক প্রস্তাবনার বিরোধিতা মাত্রই যেন তা মুক্তিযুদ্ধের মর্ম ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারণ!

অথচ আমরা দেখছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ১৯৭২ সালে সংবিধানে প্রবেশ করার আগে রাজনৈতিক দাবি বা প্রস্তাব আকারে আলোচিত হয়েছে, এমন কোনো নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে স্বভাবতই আমাদেরকে উত্তর পেতে হয়, মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা ও যুদ্ধ চলাকালীন সেই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে ন্যায্যতা তৈরি করতে হয়েছে, তাতে ইসলাম প্রসঙ্গ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলামের অনুপস্থিতি, একে সচেতনভাবে দূরে রাখা, কিংবা সরাসরি বিযুক্ত করে জনগণের মধ্যে অন্তত একটা সম্মতি সৃষ্টির প্রয়াস হতে পারে- এর সপক্ষে একমাত্র গ্রাহ্য প্রমাণ। এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার সুরাহা করতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতিগত প্রশ্নটি আগে ফয়সালা করতে হয়।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যেসব লেখাপত্র আছে, তা বোধগম্য কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসের দুটি গুরুত্ব উপাদানকে কখনোই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে না। সেই দুটি উপাদান হলো–

এক. পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন নিজেদের দাবি-দাওয়া জনগোষ্ঠীর কাছে যে ভাষায় হাজির করে, তাকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত করেছে, সেই সমস্ত ভাষ্য, কর্মসূচি, প্রচার-পুস্তিকা।

দুই. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে বয়ান ও ভাষ্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

পিনাকী ভট্টাচার্য এই দুটি উপাদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার অনুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু সে সময়কার বয়ান নয়, ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য উপাদান নির্বাচন ও গৃহীত উপাদানকে যে সম্পর্ক-সূত্র দ্বারা প্রণালিবদ্ধ করতে হয়, সেদিক থেকেও পিনাকী ভট্টাচার্য নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দাবি ও কর্মসূচি, সেই সময়কালে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য, বিশেষত অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ইত্যাদি সূত্রের আন্তঃসম্পর্ক ও প্রস্তাবিত রাজনীতিতে চরিত্রগতভাবে ইসলামের অবস্থান কী ছিল, তা ব্যাখ্যা করেছেন। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ের বিভিন্ন দলিলপত্রকে তাঁর বিশ্লেষণের জন্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যা একইসঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধের সূচনার পর নতুন রাষ্ট্রের রূপকল্প ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত প্রেরণা হিসেবে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তার সমাহার। পদ্ধতি হিসেবে যে কারো জন্যই এটাই প্রাথমিক এবং স্বাভাবিক হওয়ার কথা। সেটাই বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এতদিন হয়নি। এজন্যই আমার দ্বিতীয় দাবি, এটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের বয়ানের নতুন নির্মাণ নয়, একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার ভাষা পাঠ করার একটি নতুন ধারার সূচনা।

কিন্তু এই প্রশ্নও নিশ্চয় অনেক পাঠকের থাকবে, মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম এত প্রবল ও বিপুলভাবে আমাদের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার ভূগোল অধিকার করে থাকবার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? তাহলে পাকিস্তান থেকে আমরা রাষ্ট্র হিসেবে কী কারণে আলাদা হলাম? যে রাজনৈতিক পরিচয়কে ভিত্তি ধরে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে,

জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা যার অংশ ছিলাম, সেখান থেকে নিজেদের আলাদা করে নেওয়ার ও দেখার সঙ্গে ইসলাম প্রশ্নের মোকাবিলা কীভাবে হয়েছে ?

এই দিকটার একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম এবং বয়ানের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ভারকেন্দ্র কেন ইসলামকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয়েছে, সেই দিকটার ফয়সালা হবে না। সেই ব্যাখ্যাটি এখানে পাঠক গৌতম দাসের ব্যাখ্যামূলক পরিশিষ্টে সংযুক্ত রচনায় বিস্তারিতভাবে পাবেন। আমরা দেখব, খোদ মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে মূলগতভাবে ইসলামের আদর্শিক পাটাতনে দাঁড়িয়ে, পাকিস্তানি শাসকের বয়ান ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাল্টা ইসলামের বয়ান খাড়া করেছে। সেটা শুধু কৌশলগতভাবে পাকিস্তানি শাসকদের চালানো প্রচারণার জবাব দেওয়ার জন্য নয়। বরং এটা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া ছিল অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় গঠনের ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে যার কারণ নিহিত।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তো বটেই, বাংলাদেশের রাজনীতির নাড়ির যোগটা যারা ধরতে চাইবেন, আগামী দিনের বাংলাদেশকে পুনর্নির্মাণ বা নতুন রাজনীতির পরিগঠন করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের সকলের জন্য কেন ইসলাম কেন্দ্রীয় বিবেচ্য হিসেবে থেকে যেতে বাধ্য। *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* বইটি সামগ্রিকভাবে তারই স্বাক্ষর বহন করবে।

মুসতাইন জহির
ঢাকা, অক্টোবর- ২০১৭

সূচিপত্র

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম	১৫
মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের বয়ান-বক্তৃতায় ইসলাম	২৩
ইসলামি চিহ্ন ও পরিভাষা : স্বাধীনতার ঘোষণায় ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	২৫
মুক্তিযুদ্ধকালে সরকারি ঘোষণা ও নির্দেশনাবলিতে ইসলাম	২৯
মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের বুঝাতে ইসলামের প্রতীক ও চিহ্নের বিকৃত উপস্থাপন	৩৩
রাজাকার ছিল কারা	৪০
মুক্তিযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস খোঁজে : স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির চিঠি	৪৪
মুক্তিযুদ্ধে দেশের আলেম সমাজের ভূমিকা	৫২
মুক্তিযুদ্ধে উপমহাদেশের আলেম সমাজের ভূমিকা	৫৬
স্বাধীনতা পরবর্তী উপমহাদেশের আলেম সমাজের অবস্থান ও উপলব্ধি	৬৫
মওলানা ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধ	৬৮
রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্রে ইসলামি ভাব-প্রভাব	৭৫
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে ইসলাম প্রসঙ্গ	৮২
মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকায় ইসলাম প্রসঙ্গ	৯৯
উপসংহার	১১৩
পরিশিষ্ট : মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম– প্রসঙ্গ কথা গৌতম দাস	১১৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৪১

এক

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলটির নাম নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ। আলোচনার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী দলিল, বক্তব্য ও কর্মসূচিতে ইসলাম ও ইসলামের অনুষঙ্গ কীভাবে ছিল, প্রথমে আমরা তার একটু সন্ধান করব। এখানে সাতটি আলাদা রেফারেন্স তুলে সেই সন্ধানে যাব।

এক.

১৯৬৯ সালে প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধান সংশোধনী বিলে সংবিধানে 'ইসলামি রিপাবলিক অব পাকিস্তান' শিরোনামসহ এর ইসলামি আদর্শ বহাল রাখার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সম্মতি জানিয়েছিল।[১]

দুই.

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাদের কাউন্সিল অধিবেশন ৬ জুন ১৯৭০-এ যে কর্মসূচি গ্রহণ করে, সে বিষয়ে পরের দিন ৭ জুন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় একটি রিপোর্ট ছাপা হয়।

সেখানে বলা হয়–

'কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে যাতে কোনো আইন পাস না হইতে পারে, তজ্জন্য আওয়ামী লীগ শাসনতান্ত্রিক বিধান রাখার কথাও দলীয় কর্মসূচিতে ঘোষণা করে।

---

১. মওদুদ আহমদ, অনুবাদ : জগলুল আলম, *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১২০, ১৬৫।

শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হইবে এবং সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। আইনের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম-মর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হইবে এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে তাদের নিরাপত্তাবিধান করা হইবে। সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম আচরণ, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারেও তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।'[২]

তিন.

১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতারে ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে 'লেবেলসর্বস্ব ইসলাম নয়' অংশে তিনি বলেন–

'আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য– লেবেলসর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী, ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসুলে করীম ﷺ-এর ইসলাম; যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন; আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য'।[৩]

চার.

'৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পরে ৩রা জানুয়ারি রমনায় একটি সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীদের এই ক্ষতিকর প্রচারণা উড়িয়ে দেন যে তার দল মুসলমানের দল নয় এবং আওয়ামী লীগে মুসলমান ঐতিহ্যের চাইতে হিন্দু ঐতিহ্যেকেই ধারণ করে। সমাবেশ কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয় এবং বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান আল্লাহ্‌র ধর্মকে

---

২. নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৫৫-৫৬।

৩. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ২১।

রাজনৈতিক কার্ড হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তিনি উচ্চস্বরে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তার বক্তব্য শুরু করেন এবং একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন– 'ন্যাশনাল এবং প্রাদেশিক এসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচিত হওয়ার পরেও কোথাও কি ইসলামের চর্চা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে কোনো অভিযোগ এসেছে? মানুষ কি তার নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে চলছে না? ইসলামের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? ইসলাম কি চলে গেছে, এই মহান ধর্মে কি আর কেউ এখন দীক্ষিত হচ্ছে না? শেখ মুজিব বলেন, আমি জানি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য প্রচার চালাতে পূর্ব পাকিস্তানে কত টাকা ঢালা হয়েছে।' সমাবেশে আন্দোলনে নিহতদের মাগফেরাত কামনার জন্য ফাতেহা পাঠ করা হয়। এর মধ্যেই আসরের আযান শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই সভার কাজ মুলতবি রাখার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ নয়; বরং যারা তাঁদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করছে তারাই ইসলামের ক্ষতি করছে। সভা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই 'নারায়ে তাকবির' স্লোগান তোলেন।[৪]

পাঁচ.

৭০-এর নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। এর আগে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ স্পষ্টভাবেই ইসলাম প্রশ্নে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেছিল এভাবে–

> '৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থি হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামি নীতির পরিপন্থি কোনো আইনই এ দেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না'।[৫]

---

৪. দ্য পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, জানুয়ারি ৪, ১৯৭১

৫. নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৬৫।